www.kalerk

কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 SEP 2013
পৃ: ১৪ ... ৭

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ২০১৩ কতটা বাস্তবসম্মত

সদরে অন্দরে

মোস্তফা হোসেইন

থমথমে ভাব। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আছেন কয়েকজন অভিভাবক। হালকা আওয়াজ হচ্ছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের। মাঝেমধ্যে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানোর শব্দও কানে বাজে। ঘড়ির কাঁটা ৫টা বাজতেই অভিভাবকরা বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন। বাইরে, দরজার সামনে অসংখ্য শিক্ষার্থী মিলিত হয় অভিভাবকদের সঙ্গে। বোঝা যায়, তারাও বেরিয়ে এসেছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকেই।

এটি একজন কলেজশিক্ষকের বাসা কাম শিক্ষাদানকেন্দ্রের চিত্র। অথচ এটা কোনো স্কুল নয়, কলেজও নয়। সেখানে আছেন বেতনভুক্ত কর্মচারী। তাঁরা ওই শিক্ষককে সহযোগিতা করেন মাসিক সাড়ে ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা আয় করতে। এটি রাজধানীর একটি দৃশ্য। ব্যাচের পর ব্যাচ শিক্ষার্থীরা আসছে, পড়ছে আর যাচ্ছে। তাদের সবাই কোনো না কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এই অভিজ্ঞতাটা কিছুদিন আগের।

এমন ভাবার কারণ নেই এটি শুধু ঢাকাতেই চলছে। সারা দেশে গ্রাম-শহর নির্বিশেষেই চলছে। কোথাও কামাই হয় ৯ লাখ টাকা, কোথাও ৯ হাজার। পার্থক্য অঙ্কের হিসাবে। এর নাম কোচিং ব্যবসা। মাননীয় শিক্ষকরা চালাচ্ছেন। তাঁদের কারো জবাবদিহি করতে হয় না। জানা নেই আয়কর দেন কি না। যদি শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় নামতে গিয়ে এমন দৃশ্যের চরিত্র হতো, তাহলে হয়তো এতটা আপত্তি থাকত না। দুঃখজনক হলো, শিক্ষার্থীরা বাধ্য হচ্ছে এই কোচিং সেন্টারে নাম লেখাতে। বাধ্য করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার অভিযোগও আছে কোচিং বাণিজ্য চালানোর জন্য। সেই অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হলো, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশংসিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি আইনের প্রয়োজন ছিল। সেটিও হতে যাচ্ছে। ওই আইনের খসড়া ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ওয়েবসাইটে রাখা হয়েছিল জনগণের প্রস্তাব ও মতামত প্রদানের জন্য। একই সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমে মতামত নেওয়ার সীমিত কিছু উদ্যোগও চোখে পড়ে। সমালোচনার জবাব শিক্ষামন্ত্রী প্রচারমাধ্যমে প্রদান করেছেন। সরকারি উদ্যোগ দেখে মনে হচ্ছে, এই অধিবেশনেই খসড়া আইনটি চূড়ান্ত আইনে পরিণত হবে। কিন্তু কিছু বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার ফয়সালা কতটা হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। সরকার কি সেগুলো সংশোধন করবে? নাকি শেষ অধিবেশন বলে তাকে আইনে পরিণত করে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কের সৃষ্টি করবে। আবার শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য বিভিন্ন মাধ্যমে করা হয়েছে, তাকেও একপেশে মনে হতে পারে। সেখানেও রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক কিংবা শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারে প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৮-এর উপধারা ৫-এ যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তাকে শিক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, শিক্ষকদের হয়রানি বৃদ্ধির কৌশল এটি। আমাদের দুর্ভাগ্য, শিক্ষকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করতে হচ্ছে। এখানেই বোধ করি আমাদের ইতি টানা উচিত ছিল। একজন শিক্ষক এখনো টোল-পাঠশালা যুগের চিন্তাকে সম্বল করে চলতে থাকাটা আদৌ সমর্থনযোগ্য কি? আবার এই আইন মাধ্যমে গোটা শিক্ষক সমাজকে মর্যাদাহানির

> শিক্ষার্থীদের মানসিক কিংবা শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারে প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৮-এর উপধারা ৫-এ যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তাকে শিক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, শিক্ষকদের হয়রানি বৃদ্ধির কৌশল এটি। আমাদের দুর্ভাগ্য, শিক্ষকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করতে হচ্ছে

বিষয়টিও কি আসে না? বিকল্প কী হতে পারে? শিক্ষকদের শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই হতে পারে এই অনাচার রোধ করার বড় উপায়। সেদিকে না গিয়ে শিক্ষককে শাস্তি দিয়ে কি এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে আমাদের শিশুদের রক্ষা করা যাবে?

আইনের ধারা ১০-এর উপধারা ১-এ বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি জরুরি বিষয়। কিন্তু নিবন্ধন নিতে হলে যে হয়রানি হতে হয়, সেটি কি বন্ধ হবে?

২৩ ধারার কিছু উপধারা নিয়েও কথা ওঠে। মাধ্যমিক স্তরে নিবন্ধনের আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা বাস্তবভিত্তিক কি না ভাবার অবকাশ রয়েছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত সুবিধাসহ শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ ধাপে ধাপে করে থাকে। এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো নিবন্ধিত নয়। সুতরাং আইনের ২৩ ধারাটি পুনর্বিবেচনা কিংবা নমনীয় করার প্রয়োজন আছে।

একটু কঠোর মনে হলেও এমপিও বাতিলের যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তাকে সমর্থন করতে হবে। তবে কঠোর বিধান প্রয়োগের আগে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এমপিও বাতিলের জন্য যে ১১টি অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সেখানে পাবলিক পরীক্ষায় পরপর দুই বছর ৭০ শতাংশের নিচে উত্তীর্ণ হলে এমপিও বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই হার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধের ব্যাপারে যে শর্ত রাখা হয়েছে, সেটি অবশ্যই শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানে যে স্থবিরতা লক্ষ করা যায়, তাকে আইনের আওতায় না এনে শিক্ষায় মারাত্মক এই ক্ষত কোচিং কি বন্ধ করা যাবে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মনে করে, তাদের বেতন আসে সরকারি তহবিল থেকে, সুতরাং ক্লাস নিলেও চলে, না নিলেও চলে। শিক্ষার্থীদের দৌড়াতে হয় তাই প্রাইভেট আর কোচিং সেন্টারের দিকে।

প্রয়োজনীয় আয়ের প্রশ্নে প্রাইভেট কিংবা কোচিং বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে যাঁরা বলেন তাঁদের মনে রাখা উচিত, শিক্ষকদের মাত্র কয়েক বছর আগেও বেতনের শতভাগ স্কুলগুলোই প্রদান করত। সেখানে শতভাগ মূল বেতনের পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু অর্থও এখন সরকার থেকে প্রদান করা হচ্ছে। অথচ আগের মতোই স্কুলগুলো ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন আদায় করছে। সুতরাং শিক্ষকদের বেতন কমে যাওয়ার দোহাই দিয়ে কোচিং কিংবা প্রাইভেট বাণিজ্য চালানোর যুক্তিকে স্বাভাবিক মনে করা যায় না। তবে শিক্ষকদের প্রণোদনা হিসেবে স্কুলের পক্ষ থেকে সহযোগিতা সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

শিক্ষা আইনের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, একই ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই আইন। কিন্তু দেশে অনিবন্ধিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে যেসব কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হয়, যেখানে ৪০ লাখের মতো শিক্ষার্থী এখন শিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের নিয়ন্ত্রণহীন রেখে কি একই ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যাবে? শিক্ষাব্যবস্থায় ধনী আর গরিবের ব্যবধান থাকবে—এটা প্রত্যাশিত নয়। সে জন্যই একই ধারার শিক্ষা প্রয়োজন। আবার সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারি কিছুই থাকবে না, এমন কোনো প্রতিষ্ঠানও কাম্য হতে পারে না।

mhussain_71@yahoo.com